সাক্ষী ছিল শিরস্ত্রাণ

সুহান রিজওয়ান

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

বাতিঘর সংস্করণের ভূমিকা

সাক্ষী ছিল শিরস্ত্রাণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে। মাঝে আরও একবার ঠিকানা বদলানোর পালা শেষে এখন সেটার আবাস হতে যাচ্ছে বাতিঘর।

পেছনে তাকালে অবাক লাগে। বেশ কয়েকটা সংস্করণ বেরিয়ে যাবার পরেও পাঠকের কাছে এই উপন্যাসের চাহিদা থাকবে, লেখার সময় তেমনটা সত্যিই ভাবিনি। সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠার ভ্রু কুঁচকানো শর্ত পূরণ না করে এই কাহিনি জুড়ে আছে কেবল তীব্র বুনো আবেগ, চোখ বোলাতে গেলে এখন তাই সংকুচিত হই নিজের ছেলেমানুষি আবিষ্কার করে। তবে এটাও সত্য যে প্রথম তারুণ্যের আবেগের একরকম বিশেষত্ব আছে, সততাই তার শক্তি। আমার ধারণা, এই লেখার দুর্বলতাকে পাঠক ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই সততার কারণেই।

তাজউদ্দীন নামের মানুষটি সমস্ত জীবন দিয়ে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ করে গেছেন, *সাক্ষী ছিল শিরস্ত্রাণ* প্রকাশিত হবার পরে আবিষ্কার করেছি, বহু মানুষ আজও গভীর শ্রদ্ধায় নীরবে মানুষটিকে স্মরণ করেন। এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাসকে আমি তাই ভাবতে চাই সেই অনন্য মানুষকে স্মরণ করবার আরও একটা উপলক্ষ হিসেবে।

ধন্যবাদ বাতিঘরের দীপঙ্কর দাশকে, নতুন করে এই উপন্যাস প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে। অশেষ শ্রম ও ধৈর্য দিয়ে নতুন সংস্করণের জন্য পাণ্ডুলিপিকে খুঁতহীন করতে চেয়েছেন বলে বিশেষ একটি ধন্যবাদ বাতিঘরের সম্পাদক মোজাম্মেল মাহমুদের জন্যও। আশা রাখি, নতুন এই সংস্করণেও পাঠক ভালোবেসে গ্রহণ করবেন *সাক্ষী ছিল শিরস্ত্রাণ*কে।

সুহান রিজওয়ান
rizwanshuhan@gmail.com
ঢাকা, অক্টোবর ২০২৩

সীমান্তের সন্ধ্যা

সন্ধ্যা নামার মুহূর্তে হঠাৎ করেই মানবজাতি সূর্যের প্রতি এক ধরনের মায়া বোধ করে। যে সূর্য সমস্ত দিন কাটিয়েছে মানুষের প্রশংসামিশ্রিত নিন্দা শুনে, গোধূলিকালে কেন যেন সেই সূর্যই মানুষের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে।

অথচ তারা দুইজন সূর্যের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছেন না। তারা বসে আছেন। একজন বসেছেন বড়ো একটা গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকিয়ে। অন্যজন বসে আছেন কাছেই একটা প্রায় শুকনো খালের ওপরের কালভার্টে।

চারপাশ ঘন সবুজ। বাইরের সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ করে এই সবুজের মাঝে ঢুকে পড়লে সবকিছু কেমন অবাস্তব ঠেকে চোখে। অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছের উঁচু বেষ্টনী চারপাশে, সেগুলো ঘিরে আছে পিপুল পাতার জাল, পশ্চিমাকাশের সূর্যের আলো এগুলো ভেদ করে আসতে পারছে না ঠিকমতো। গাছতলায় তাই ছায়া থাকলেও বাতাস বইছে না, বরং অসহ্য গরম। এই তপ্ত আবহাওয়ায় ঘন ছায়ার মাঝে বসে থাকলে অবসন্ন লাগাটা স্বাভাবিক। আমীর-উল ইসলামের সেটি লাগছেও।

জায়গাটা সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ডের কাছে, জীবননগর, টঙ্গী খাল। সময়টা শেষ বিকেল। দিনটা ৩০ মার্চ, ১৯৭১।

তারা দুইজনে অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করছেন মাহবুব উদ্দীন আর তৌফিক এলাহির জন্যে। আমীর-উল ইসলাম মনে মনে আরেকবার নিজের সঙ্গীর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। ভদ্রলোক প্রথমেই সীমান্তের ওপারে সশরীরে না গিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন মাহবুব আর তৌফিক সাহেবকে দিয়ে। বার্তাটি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট।

স্বাধীন, সার্বভৌম, নবজাতক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে দুইজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এসেছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। ভারত সরকার তাদের যথাযোগ্য সামরিক মর্যাদা দিয়ে বরণ করতে সম্মত রয়েছেন কি না।

আমীর-উল ইসলাম বয়েসে তরুণ বলেই যেন একটু বেশিই উত্তেজিত, অযথা চঞ্চল। তার থেকে থেকে বোধ হচ্ছে যে এখানে রচিত হচ্ছে একটি স্বাধীন জাতির ইতিহাস, আর হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার প্রতিটা পাতা অনুভব করছেন তারা দুইজন। বড়ো বিরল এই সৌভাগ্য। মাহবুব আর তৌফিকের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অভ্যাসবশত আমীর-উল ইসলাম নিজের দাড়িতে হাত বোলান। এবং চমকে ওঠেন।

পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায়, শখের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি তিনি কেটে ফেলেছেন ঢাকা ত্যাগের সময়েই। নিজের কাছেই নিজে বোকা বনে যাওয়া আমীর-উল ইসলাম হেসে ফেলেন।

ঠিক সেসময় আমীর-উল ইসলাম লক্ষ করেন, তার সঙ্গীও হাসছেন। নিঃশব্দে।

'ভাবছি', হাসি মুখে ঝুলিয়েই তার সঙ্গী বলেন, 'ভাবছি যে আমি আজ হেরে গেলাম।'

আমীর-উল ইসলাম ঠিক বুঝতে পারেন না কথাটা। 'কিন্তু ... আপনি এই কথা বলছেন কেন ভাই? আমরা তো বিজয়ের পথেই যাচ্ছি ...'

তার সঙ্গী হেসে ফেলেন এবারো। বলেন, 'ঠিক তা না। ... সাতচল্লিশে যখন পাকিস্তান হলো, তখন থেকেই ক্লাসের অমুসলিম বন্ধুরা আমায় বলত, দেখে নিস, তোদের এই পাকিস্তান টিকবে না। আমি ভেতরে ভেতরে ঠিকই জানতাম সেটা। কিন্তু কী জানেন, তবুও আমি যুক্তির জোরে তাদের সাথে তর্ক লড়তাম তখন। ওদের যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে এটা হতে পারে, ওটা হতে পারে, এই এই কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রটা টিকেও যেতে পারে।

অথচ আজকে দেখেন, ওদের কথাটাই কিন্তু ঠিক প্রমাণ হয়ে গেল। আমি তর্কে হেরে গেলাম শেষ পর্যন্ত। এজন্যেই বললাম, আমি আসলে আজ যুক্তিতে হেরে যাওয়া একজন মানুষ।'

আমীর-উল ইসলাম কী বলবেন খুঁজে পান না। ২৫শে মার্চের রাতে ঢাকায় কী ঘটেছে, তা তো তারা নিজের চোখেই দেখেছেন। রায়ের বাজারের পেছনের নদী পার হবার সময় হাজারো ঘরহারা মানুষের কাফেলার দৃশ্য মনে পড়ে যায় আমীর-উল ইসলামের, কী জান্তব মৃত্যুভয় তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এই ভেবে অসহায় বোধ করেন তিনি। আমীর-উল ইসলামের করোটির ভেতরটা আবার ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারুণ্যের আবেগে তাৎক্ষণিক প্রতিশোধের নেশায় টগবগ করতে থাকেন তিনি।

বেশিক্ষণ এই চিন্তা সহ্য হয় না ক্লান্ত শরীরে, অসহনীয় গরমে বসে থাকতে না পেরে একসময় মাটির ওপরেই গা এলিয়ে দেন আমীর-উল ইসলাম। পিঠে যেন ছ্যাঁকা পড়ে যায় প্রথমে। সারাদিনের গরমে তেতে আছে জায়গাটা। তবুও অবসন্ন শরীর ওইটুকু সহ্য করে নিয়ে বিশ্রাম চায়।

আমীর-উল ইসলামের চোখে হালকা ঘুম নেমে আসে। কাছেই তার সঙ্গী বসে থাকেন একাকী, গভীর চিন্তায় ডুবে থেকে ধ্যানমগ্ন। অজানা ভবিষ্যতের অপেক্ষা হতেই বোধহয় জন্ম তার একাগ্র চিন্তার।

সন্ধ্যার খানিক পরেই হঠাৎ বুটের শব্দ। পাশের ঝোপ থেকে মার্চ করে এগিয়ে আসে একদল জওয়ান। সবার পেছনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মাহবুব আর তৌফিকের পরিচিত মুখ।

জওয়ানদের একদম সামনে সামরিক উর্দি পরা মধ্যবয়স্ক লোকটিকেই হাবেভাবে

তাদের নেতা বলে বোঝা যায়। এগিয়ে এসে সে মুখ খোলে ইংরেজিতে। 'স্যার, আই অ্যাম ক্যাপটেন মহাপাত্র। ইউ আর ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্যাম্প।'

পেছনের সৈনিকেরা বেয়োনেটসহ বন্দুক উঁচিয়ে ধরে, সশব্দ স্যালুট জানায়। আমীর-উল ইসলাম ক্লান্তি লুকিয়ে দৃঢ় পায়ে সামনে এগিয়ে যান। খেয়াল করলে হয়তো সবাই দেখতে পেত—এই সন্ধ্যা, এই সীমান্ত, এই পুরো দৃশ্যটিই যেন কোনো অলৌকিক পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। কেউ দেখেনি, কারণ কোথাও বাধা পায়নি বাতাস—নীরব হয়নি চারপাশের ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ—পৃথিবীতে কোথাও কোনো কিছু থেমে নেই।

কিন্তু ঠিক এসময়েই আমীর-উল ইসলাম এবং তার সঙ্গী, স্বাধীন বাংলাদেশের দুই প্রতিনিধি পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় প্রবেশ করলেন ভারতে। এই অনন্যসাধারণ মুহূর্তটি ইতিহাসের বুকে চেপে বসল আজ হতে।

অবিলম্বে এসে পৌঁছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আইজি গোলোক মজুমদার। প্রথম দর্শনেই তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন আগত দুই 'রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি'দের দেখে। জীবনে এমনটা দেখেননি তিনি। এরা নাকি রাষ্ট্রদূত! অথচ খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে, পরনে ময়লা গেঞ্জি আর লুঙ্গি; একদম সাধারণ কৃষকদের যেমন থাকে! গোলোক বাবুর অবশ্য জানার কথা নয়, অহেতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাননি বলেই এই দুইজন নিয়েছেন কৃষকের ছদ্মবেশ।

গোলোক মজুমদার কাজের মানুষ। অনাবশ্যক কথা না বাড়িয়ে তিনি দ্রুত তুলে নিলেন এই দুইজনকে। যাত্রা হলো শুরু, গন্তব্য সেই দমদম। দিল্লির সাথে ইতোমধ্যেই যোগাযোগ হয়ে গেছে। অজ্ঞাতনামা এই দুই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির প্রাথমিক গন্তব্য হবে কলকাতা।

কিন্তু ভেতরের কৌতূহল কিছুতেই দমাতে পারছিলেন না গোলোক মজুমদার। থাকতে না পেরে অবশেষে আরোহীদের দিকে ফিরে তাদের পরিচয় চেয়েই বসলেন তিনি।

'আমি আমীর-উল ইসলাম।' তরুণটি বলেন।

'আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একজন প্রতিনিধি মাত্র,' তরুণের সাথের ছোটোখাটো মানুষটি একটু হাসবার ভঙ্গি করে বলেন। 'আমার নাম তাজউদ্দীন আহমদ।'

জিপ ছুটে চলেছে দমদমের রাস্তায়। ইতিহাস তখনো জানে না—ইতিহাস জানবে আগামী দুইশত বাষট্টি দিনে—এই ছোটোখাটো মানুষটিই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ভেতরের বাইরের অগণিত শত্রুর সাথে লড়াই করে যাবেন প্রতিনিয়ত, বহুবার স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একক নির্ভুল সিদ্ধান্তে হতাশ করবেন স্বাধীনতার শত্রুদের। বঙ্গবন্ধুর প্রবল ব্যক্তিত্বের আড়ালে চিরকাল অনালোকিত থেকে যাওয়া এই মানুষটিই জাতির সবচেয়ে সংকটের সময়ে নেতৃত্ব দেবেন প্রচারের আড়ালে থেকে।

এই তাজউদ্দীন, হয়ে উঠবেন, উনিশশো একাত্তরের নিঃসঙ্গ সেনাপতি।

জয় বাংলা

তারেকুল আলম বাদামের খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিল। পাশে বসা মৃণাল রেডিওর নব ঘুরিয়ে সেটাকে আরও স্পষ্ট করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। মোশারফ একটা সিগারেট ধরিয়েছে, তার দৃষ্টি সামনের মাঠের দিকে।

'রকিবুল পোলাটা একটা বাঘের বাচ্চা!' তারেকুলের পায়ের কাছে বসা আলাউদ্দীন বলে। 'সাহস আছে।'

তারেক মনে মনে একমত হয়। পুরো পূর্ব পাকিস্তান থেকে মূল পাকিস্তান দলে সুযোগ পাওয়া একমাত্র ক্রিকেটার এই ১৮ বছরের রকিবুল হাসান। গত কয়েক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ ফর্ম ছেলেটার, নিউজিল্যান্ডের সাথে গত বছরের টেস্ট দলেও রাখা হয়েছিল তাকে, যদিও নামানো হয়নি মূল একাদশে। দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে দলে ছিল রকিবুল।

ঢাকা স্টেডিয়ামে এখন চলছে পাকিস্তান একাদশ আর কমনওয়েলথ একাদশের মধ্যে চারদিনের ম্যাচ। রকিবুল এবার মূলদলেই সুযোগ পেয়েছে, সে ওপেনার।

মোশারফকে একটু হতাশ শোনায়। 'রান আরেকটু বেশি করলে ভালো হইত।' রকিবুল দুই ইনিংসেই রান করেছে মাত্র এক।

'বেশি কথা বলিস না।' তারেক একটু রেগে যায় এইবার। 'ব্যাটের মাঝে জয় বাংলা স্টিকার লাগায়া নামসে খেলবার সময়, বুঝোস, জয় বাংলা! পশ্চিম পাকিস্তানের মাউরাগুলা তো নামসিল ভুট্টোর মার্কা তলোয়ারের স্টিকার নিয়া। ন্যায্য জবাব দিসে পোলাটা।'

মোশারফ কিছু একটা বলবার জন্যে মুখ খুলতেই মৃণাল হাত নেড়ে সবাইকে থামিয়ে দেয়। রেডিওতে থেমে থেমে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেলা একটায় জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। গ্যালারি ভরিয়ে রাখা দর্শকেরা ভাগ হয়ে আছে ছোটো ছোটো দলে, অনেকের হাতেই রেডিও। কী বলেন ইয়াহিয়া, জানতে চায় সকলেই। মৃণাল আরেকবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সকলকে নীরব হতে ইশারা করে রেডিওর আওয়াজটা বাড়িয়ে দেয়।

লন্ডন থেকে বড়োভাইয়ের পাঠানো হাতঘড়ির দিকে তাকায় তারেকুল আলম। বেলা একটা বেজে পাঁচ মিনিট। ১লা মার্চ, ১৯৭১।

ইয়াহিয়া খানের নিরাবেগ ঘোষণা ভেসে আসে রেডিওতে। 'একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।'

ঢাকা স্টেডিয়ামে সমবেত বিপুল পরিমাণ বাঙালি দর্শক এক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে

থাকে। কী করতে হবে, হঠাৎ যেন বুঝে উঠতে পারে না তারা। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণার মানে যে বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে অস্বীকার করা, এটা বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হয় না কারুরই।

সর্বপ্রথম প্রতিবাদটা আসে উত্তেজিত আলাউদ্দীনের কাছ থেকেই। লাফিয়ে উঠে সে চিৎকার করে বলে, 'হারামজাদা!'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দর্শকের প্রত্যেকে নিশ্চয়ই ছটফট করছিল কিছু একটা করবার জন্যে, দরকার ছিল শুধু একটি প্রভাবক মাত্র। আলাউদ্দীনের চিৎকারটা সেই প্রভাবকের কাজটিই করে দিল। হঠাৎ যেন বারুদ পড়ল ফুঁসতে থাকা দর্শকদের সারিতে। এক মুহূর্ত পরেই 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা—মানি না, মানব না।' স্লোগান উঠল গ্যালারিতে। 'জ্বালোরে জ্বালো, আগুন জ্বালো' স্লোগানে আকাশ কাঁপিয়ে দর্শকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাঠের কাঁটাতারের বেষ্টনীর ওপর।

মাঠের খেলা থেমে গেছে ততক্ষণে। বিদেশি খেলোয়াড়েরা ছুটছেন ড্রেসিংরুমের দিকে। কাঁটাতারের জাল ছিঁড়ে মাঠে ঢুকে পড়েছে দর্শকদের একাংশ। আগুন ধরিয়ে দিল তারা মাঠের স্টাম্প, ব্যাট আর পড়ে থাকা প্যাডে।

যতদূর শোনা যায়, পৃথিবীতে যেন কেবল মাত্র দুটি শব্দ রয়েছে এখন।

'জয় বাংলা!'

ওরা চারজন উত্তেজিত জনতার সাথে স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে এল স্টেডিয়ামের বাইরে। সে কী দৃশ্য চারদিকে! সমস্ত ঢাকা শহর যেন ফুঁসে উঠেছে এই কয়েক মিনিটের মাঝে।

তারেকের শার্টের হাতা ধরে টান দেয় মৃণাল। 'ইউনিভার্সিটির দিকে চল, বটতলায়। কিছু হইলে ওইখানেই সবার আগে জানা যাবে।'

আলাউদ্দীন এইখানে বিদায় নেয় ওদের কাছ থেকে। সে যাবে পুরানা পল্টনের আওয়ামী লীগের অফিসের দিকে। বাকি তিনজন রওয়ানা হয়ে যায় ভিড় ঠেলে। ঢাকা শহর অচেনা ঠেকে ওদের কাছে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রাস্তার দুই পাশেই। লোকজন তাড়াহুড়ো করে কেনাকাটা করছে সামনে গণ্ডগোলের আশঙ্কা করে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও উত্তেজনা। ছাত্ররা ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা শোনার সাথে সাথে ক্লাস বর্জন করে বাইরে চলে এসেছে। হাজারে হাজারে ছাত্র জড়ো হয়েছে বটতলায়। ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে রুমীর সাথে দেখা হয়ে যায় ওদের। এই ভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ওর সাথে পরিচয় তারেকের।

'এই যে তারেক, আরে কোথায় ছিলা তোমরা এতক্ষণ?' রুমী বলে।

'স্টেডিয়ামে ছিলাম', তারেক উত্তর দেয়। 'ওইখানেই রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম ইয়াহিয়ার। তুমি কই ছিলা মিয়া? এইদিকের কী অবস্থা এখন?'

'আরে আমিও তো মাঠে ছিলাম। দেখলাম না তো তোমাদের ...। যাক, এইদিকে

কিন্তু ছাত্ররা ফেটে পড়ছে একেবারে। ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা ঠিক করেছেন তিনটা বাজে পল্টনে মিটিং করবেন, অবশ্যই আসবা। আর আমি অবশ্য এখনই যাচ্ছি। এক বন্ধুর মোটরসাইকেল আছে, পিছনে চেপে চলে যাব। পরে দেখা হবে ...', এসব বলে রুমী ছুটতে ছুটতে চলে যায় কোথায় যেন।

মোশারফ ইতোমধ্যে কোত্থেকে একটা লোহার রড জোগাড় করে এনেছে। চারপাশের অনেকের হাতেই বাঁশের লাঠি আর রড। ছাত্ররা পরবর্তী কর্মসূচি শুনতে চায় নেতাদের কাছ থেকে।

পল্টন ময়দানে চলে আসে ওরা। কখন যেন সেখানেও একটা উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে। মঞ্চে শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব বক্তৃতা দেয়া শুরু করেছেন। সকলের বক্তব্যেই মোটামুটি একই অনুরোধ, ছাত্র-জনতা যেন শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলে।

কোথায় নির্দেশ দেবেন শেখ মুজিব? হাজার হাজার মানুষ হাতে লাঠি রড নিয়ে পল্টন ময়দান থেকে চলল হোটেল পূর্বাণীতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন সেখানে। রাস্তায় যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষের মাথা আর তাদের হাতের লাঠি। থেকে থেকে জয় বাংলা হুংকারে কেঁপে উঠছে আকাশ। রাস্তায় পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হচ্ছে প্রকাশ্যে, সাথে রয়েছে জিন্নাহর ছবি!

আলাউদ্দীনের সাথে এখানে আবার দেখা হয়ে গেল ওদের। সে নাকি গুলিস্তানের কামানের ওপর মতিয়া চৌধুরীর ভাষণ শুনে এসেছে। আরও সব চাঞ্চল্যকর ঘটনা শোনা যায় তার কাছে। লোকজন নাজ সিনেমা হলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নবাবপুর রেল ক্রসিংয়ের দুই পাশে যত সাইনবোর্ড লেখা ছিল, শুধু বাংলায় লেখা ছাড়া বাদবাকি সব উপড়ে নিয়েছে ক্ষিপ্ত মানুষ।

শেখ মুজিব সাংবাদিকের উদ্দেশে প্রেস কনফারেন্সে বললেন, এই ঘোষণা খুবই দুঃখজনক। সবকিছুই শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে করা দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র। আরও বললেন, সাত তারিখ রেসকোর্সের জনসভায় তিনি পূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

এইভাবে সারাটা দিন মিছিলে স্লোগানে কাটিয়ে দিয়ে তারেক যখন হলে ফিরল, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। হলের ছেলেদের মাঝেও উত্তেজনা, চারপাশের লোহার শিক দিয়ে তৈরি বেষ্টনী ভেঙে ফেলেছে ছাত্ররা। হলের প্রতিটি ঘরে জমা করা হচ্ছে এইসব রড, পশ্চিমা শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে আসতে পারে হয়তো এগুলো। যদিও সমরাস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিমা সেনাদের বিরুদ্ধে কার্যত এগুলো খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়, সেটা জানে সকলেই।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ওয়েস্ট হাউজের ১৪২ নম্বর রুমের বাসিন্দা অর্থনীতির ছাত্র তারেকুল আলম জানল না, অন্য সকলের মতোই, ১৯৭১-এর উত্তাল মার্চ শুরু হয়ে গেছে।

মিছিলের ঢাকা

বাংলা একাডেমি একদম নীরব। অনুবাদ বিভাগের পিয়ন আবদুল বাতেন করিডোরের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে তাকিয়ে দেখল। কেউ নেই। করিডোরে দেখা যাচ্ছে না প্রতিদিনের পরিচিত কর্মব্যস্ত মুখগুলোকে, অন্য দিনের মতো টেবিলের ওপর ফাইল চাপড়ে রাখার শব্দও নেই আজ।

আবদুল বাতেন নিচে নেমে এল। বুড়ো দারোয়ানটাকেও দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। সদর দরজা ভেজানো, কাজেই ভেতরে ঢুকতে বা বাইরে বেরুতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু দারোয়ান গেল কোথায়? দু'তিনবার গলা তুলে 'চাচা মিয়া! আছেন নাকি?' বলে ডেকে দেখল আবদুল বাতেন। কেউ সাড়া দিল না।

গতকাল দুপুর থেকে শরীরটা হঠাৎ করেই খারাপ করছিল বাতেনের। অসুস্থতার কথা বলে দুপুরের পর ছুটি নিয়ে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল সে, রাতেও আর ফিরে যায়নি নিজের মেসে—আরামবাগে। একটু পরপরই অবশ্য মিছিলের শব্দে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল তার। মিছিলের কথা মাথায় আসতেই একাডেমির আজকের লোকসংকটের কারণটা ধরে ফেলল বাতেন। আজ তো হরতাল। শেখ সাহেব হরতাল ডেকেছেন আজ, মনেই ছিল না এই কথা।

আবদুল বাতেন তার সাইকেলটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। রাতের হালকা জ্বর ভাবটা কেটে গিয়েছে, প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে এখন। রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা চোখ বুলিয়েও একটা রিকশা পর্যন্ত দেখতে পেল না সে। কড়া হরতাল হচ্ছে তাহলে। মেসে ফিরে যাবে মনে করে সাইকেলে যখন চড়তে যাবে আবদুল বাতেন, তখনই দেখা গেল মিছিলটাকে। কার্জন হলের ওদিক থেকে আসছে।

মিছিল খুব বেশি বড়ো নয়। ষাট-সত্তরজন লোক হবে বড়োজোর। তবে ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়ছে মিছিলে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, মিছিলের প্রত্যেকেই সশস্ত্র। চেরা বাঁশ, লোহার রড, বড়ো আকারের কাঠ—সবাই হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে তা নিয়েই যেন বেরিয়ে এসেছে। আর কী সব স্লোগান সবার মুখে!

মিছিলে শিববাড়ি এলাকার এক পরিচিত মুখ চোখে পড়ে বাতেনের। লোকটা এগিয়ে আসে। 'বাতেন ভাই, এখনো দাঁড়ায়া আছেন ক্যান? চলেন, বটতলায় চলেন। সাইকেল রাইখ্যা চলেন আমাগো লগে।'

হতবুদ্ধি আবদুল বাতেন সাইকেল রেখে দেয় একাডেমি চত্বরে। 'বটতলায় ক্যান? সেইখানে কী হইব আইজ?'

'ছাত্ররা মিছিল ডাকছে আইজকা, এগারোটার সুমায়। ক্যান, আপনি জানেন না?'

আবদুল বাতেন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ে। তারপর যোগ দেয় ওদের সাথে।

মিছিল এগোয় জয় বাংলা স্লোগানের সাথে সাথে। সামনের মোড়টা ঘুরেই হতবাক হয়ে যায় বাতেন। এত মানুষ আগে আর কখনো দেখেনি সে। অগুনতি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পর্যন্ত যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। বাতেন মিছিলের সাথে মিলে গিয়ে এগোতে চায় বটতলার দিকে। তবে বটতলায় পৌঁছানো হয়ে ওঠে না আর ওদের মানুষের চাপে। এতএত মানুষের ভিড়ে ওদের মিছিলটা আসতে পারে কলাভবনের পশ্চিমে পর্যন্ত।

মাইকে তখন অবিরাম প্রচার হচ্ছে স্বাধীনতার স্লোগান। ছাত্রনেতারা বক্তৃতা দিচ্ছে, গলায় ওদের আগুন। তারা বলছে, চব্বিশটা বছর ধরে বাঙালিদের খালি শোষণই করে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা। বাঙালিদের ওরা মানুষই মনে করে না। আমাদের বন্যা সমস্যার কোনো সমাধান হয় না; ওদিকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয় পশ্চিমে। ভাষার দাবির মিছিলে যে পুলিশ গুলি চালায়, সেও ওদেরই নির্দেশে।

শুনতে শুনতে আর সবার মতোই ফুঁসতে থাকে বাতেন। 'শালা! আমার দেশের মানুষের ওপরে গুলি চালাবে উর্দু বলা কিছু আর্মি? আমার দেশের মাটিতে অধিবেশন বসাতে অনুমতি নিতে হবে ওই ইয়াহিয়া খানের?' ক্ষোভে উন্মাদ আবদুল বাতেনের হঠাৎ করেই নিজেকে এই বিশাল মিছিলের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হয়। এই যে এতগুলো মানুষ—কত রকমের জামাকাপড় পরা—কত বিচিত্র শ্রেণির—কত আলাদা তাদের কথা বলার ধরন; কিন্তু সবাই এখানে এক হয়ে গেছে শোষিত হতে হতে। পশ্চিমাদের সাথে তো তাদের ধর্ম ছাড়া আর কোনো সাদৃশ্য নেই; ওদের অকারণ জুলুম আর কতকাল মুখ বুজে মেনে নিতে হবে আমাদের?

হঠাৎই চারপাশের মানুষগুলো গর্জন করে ওঠে। একটা নতুন পতাকা দেখা যাচ্ছে সামনে কার হাতে যেন। অগণিত মানুষের ভাবনা স্লোগান হয়ে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। 'এইটা বাংলাদেশের পতাকা, উড়ায় দাও, উড়ায় দাও।'

নেতারা পতাকা উড়িয়ে দেন। সবুজ একটা জমিনের মাঝে রক্তলাল একটা বৃত্ত। এর মাঝে সোনালি হলুদে একটা মানচিত্র। কী অদ্ভুত সুন্দর! বাতাসের স্পর্শে সগর্বে উড়তে থাকে স্বাধীন বাংলার পতাকা, সবাইকে মুগ্ধ করে। অন্যরকম একটা মাদকে আচ্ছন্ন তখন উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ।

পতাকা ওড়ানোর পরে শুরু হয় ছোটো ছোটো বেশ কিছু শোভাযাত্রা। বায়তুল মোকারমের দিকে যাচ্ছে, এরকম একটা দলে যোগ দিয়ে দেয় বাতেনও।

এর মাঝে আবদুল বাতেন ভুলে গেছে আর সব। সে ভুলে গেছে আরামবাগের মেস, সে ভুলে গেছে অসুস্থতা, সে ভুলে গেছে ক্ষুধা। মিছিলের সামনে থাকা আবদুল বাতেন আকাশবাতাস প্রকম্পিত করে কেবল স্লোগান দিতে থাকে, 'জয় বাংলা!'

মিছিল এগিয়ে যায়। হাইকোর্টের কাছাকাছি এসে শামসুদ্দীন স্যারের সাথে দেখা হয় আবদুল বাতেনের, উনি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ধারে। শামসুদ্দীন স্যার বাংলা